পৌরানিক অতিকথন বনাম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান -২

অনন্ত

ইমেইলঃ ananta_atheist@yahoo.com

১৯-১০-০৫

রাম জন্মভূমি ও বাবরি মসজিদ সমস্যা :

পূর্ববর্তী প্রকাশের পর .....

আমরা জানি, হিন্দু ধর্মালম্বীরা (গোঁড়া হিন্দু+সাধারণ হিন্দু) রামায়ণকে ধর্মগ্রন্থ আর রামকে বিষ্ণু -র অবতার বলে বিশ্বাস (অপবিশ্বাস) করে থাকেন এবং অনেকে পুঁজোও করে থাকেন। গত পর্বে আমরা বিভিন্ন হিন্দুধর্মগ্রন্থের (ঋগ্বেদ সংহিতা ও সামবেদ সংহিতা) আলোকে দেখতে পেয়েছি যে, এই বিষ্ণু-ই হচ্ছেন আকাশের সূর্য। প্রাচীনকালে জ্ঞানবিজ্ঞানে পিছিয়ে থাকা মানুষেরা সূর্যকে অতিপ্রাকৃত স্বত্তা ভেবে মন্ত্র উচ্চারণ করতো, পুঁজো করতো। কিন্তু আজ আধুনিক কালের সাধারণ মানুষেরা জানে, সূর্য কি? আমাদের এই সৌরজগতে সূর্য হচ্ছে কতিপয় গ্যাসের সমন্বয়ে (সূর্যের ভেতরের মূল রাসায়নিক পদার্থসমূহ হচ্ছে, হাইড্রোজেন- ৯২.১%, হিলিয়াম-৭.৮%, অক্সিজেন-০.০৬১%, কার্বন-০.০৩০%, নাইট্রোজেন-০.০০৮৪%, নিয়ন-০.০০৭৬%, লৌহ-০.০০৩৭%, সিলিকন-০.০০৩১%, ম্যাগনেসিয়াম-০.০০২৪%, সালফার-০.০০১৫% এবং অন্যান্য-০.০০১৫%।) গঠিত একটি নক্ষত্র মাত্র। সূর্যের মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে ৬০০ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেন গ্যাস ৫৯৬ মিলিয়ন টন হিলিয়াম গ্যাসে রূপান্তরিত হচ্ছে আর বাকি ৪ মিলিয়ন টন শক্তিতে পরিণত হচ্ছে যা আমরা আলো হিসেবে অবলোকন করে থাকি। সূর্যের ভিতরের এই বিপুল পরিমান শক্তির উদগিরণের ফলে সূর্যেরপৃষ্ঠের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৪০,০০০ ওয়াট আলোক শক্তি নিঃসৃত হয় (সূর্য সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে আগ্রহীরা ভিজিট করুন www.solarviews.com/eng/sun.htm অথবা http://observe.arc.nasa.gov/nasa/exhibits/sun/sun_5.html)। যদিও এই মহাবিশ্বে সূর্য ই একমাত্র বড় বা আলোক উজ্জ্বল নক্ষত্র নয়, সূর্যের থেকে হাজারগুন বড় এবং আলোকউজ্জ্বল নক্ষত্র রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই গ্যাসীয় পিন্ডের একটি পদার্থ কি করে আমাদের এই পৃথিবীতে মানুষরূপের জন্ম গ্রহন করতে পারে? ভ্রান্ত জ্ঞানের ব্যাপ্তি কতটুকু পল্লবিত হলে এই রকম কল্পনা করা সম্ভব? যাই হোক, প্রাচীনকালের মানুষের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ হয়নি বলেই তারা এই ধরনের ভ্রান্ত জ্ঞানের শিকার হয়েছিলেন, এই ক্ষেত্রে তাদের কোন দোষ দেখছি না। হয়তো সেই সময়, আমরাও এরকম ভ্রান্ত জ্ঞানের শিকার হতাম। কিন্তু আজকের এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও বিপুল সংখ্যক হিন্দুধর্মালম্বীরা (এর মধ্যে ডিগ্রিধারী জ্ঞানীগুনী, রথীমহারথী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, আমলা থেকে শুরু করে রাস্তার ভিক্ষুক পর্যন্ত রয়েছেন) যখন রামকে বিষ্ণুর (সূর্যের) অবতার বলে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে দাবি করেন, মন্দিরে গিয়ে পুঁজো দেন, রাস্তায় গলা ফাটিয়ে স্লোগান তুলেন ‘‘**রাম ভক্তিই, রাষ্ট্র (ভারত) ভক্তি**’’, তখন তাদেরকে কি বলা যায়? জ্ঞানপাপী, সুবিধাবাদী, সাম্প্রদায়িক, ভন্ড না অন্য কিছু? শ্রদ্ধেয় পাঠক, আপনারাই নির্ধারণ করুন।

আরোও কিছু রামায়ণ কথা : গত পর্বে আমর উল্লেখ করেছিলাম, বাল্মীকি রামায়ণ, তুলসী রামায়ণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ছাড়াও আরও কিছু রামায়ণ প্রচলিত আছে। যেমন- প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্গত দশরথ জাতক রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, উত্তর রামায়ণ, দক্ষিণ রামায়ণ ইত্যাদি (*ভারতের বাইরে এশিয়ার বহু দেশে রামায়ণ-এর অনেক বিকল্প কাহিনী প্রচলিত আছে, এ ব্যাপারে আগ্রহীরা বিস্তারিত অলোচনার জন্য দেখুন* ***V. Raghavan, The Ramayana in Greater India, South Gujarat University, Surat, 1975.***)। এসবের একেকটিতে একেকভাবে চিত্রিত রয়েছে রামায়ণ

কাহিনী। কোথাও রাম, সীতা, লক্ষণ, ভরত ভাইবোন, কোথাও সীতা রাবণ ও মন্দোদরীর পরিত্যক্তা কন্যা, যাকে রাজা জনক ক্ষেতের আলে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। আবার পন্ডিত শ্রী উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এর প্রণীত গ্রন্থের (***শ্রী উপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের পূরাবৃত্ত- প্রথম খন্ড (৮০০০খ্রীষ্টপূর্ব হতে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত), বি সরকার এন্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৫০।***) পূর্বাভাস অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে রাম, সীতা ভাই-বোন। ভরত ছিলেন মালব রাজ্যের আর্যজাতীয় এক রাজন্য পরিবারের সন্তান, এবং এক অর্থে রাম-সীতার দার্শনিক গুরু। যাই হোক, এখন আমরা দশরথ জাতক রামায়ণ কাহিনীকে সংক্ষেপে উল্লেখ করবো।

দশরথ জাতক রামায়ণ : বিশিষ্ট অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায় তাঁর ***মহাকাব্য ও মৌলবাদ*** গ্রন্থে (***পৃষ্ঠা- ৩১***) লিখেছেন, '' বৈদিক সাহিত্য, পানিনীর রচনা কিংবা পতঞ্জলির 'মহাকাব্য'-এ রাম অথবা রামায়ণের কোন উল্লেখ নেই, যদিও মহাভারতের অনেক চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় প্রথম দুটিতে। রামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 'দশরথ জাতক' নামক প্রাচীন বৌদ্ধ কাহিনীতে। ..... জার্মান ভারতবিদ অ্যালাব্রেক্ট ওয়েবার, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ড. সুকুমার সেনের মতে এটাই ছিলো আদি রামায়ণ।'' এর সময়কাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। তবু ঐতিহাসিকেরা ধারণা করেন, দশরথ জাতক রামায়ণ পালি ভাষায় ১৩টি গাথায় খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতক থেকে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এটি রচিত হয়েছিলো।

এখন আমরা চলুন সেই দশরথ জাতক (***' জাতক '; চতুর্থ খন্ড, শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ, অনুদিত, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৮৫, পৃষ্ঠা ৮৭-৯১।***) কাহিনীই শুনি - পুরাকালে বারাণসীতে দশরথ নামে এক মহারাজা ছিলেন। তিনি ছন্দ, দ্বেষ, মোহ, ভয় এই চতুর্ব্বিধ অগতি পরিহার করিয়া যথাধর্ম প্রজাপ্রালন করিতেন। তাঁহার ষোড়শ সহস্র অন্তঃপুরচারিনী ছিলেন; তন্মধ্যে অগ্রমহিষীর গর্ভে দুই পুত্র এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রামপন্ডিত, কনিষ্ঠ পুত্রের নাম লক্ষণকুমার এবং কন্যার নাম সীতাদেবী।

কালসহকারে অগ্রমহিষীর মৃত্যু হইল। দশরথ তাঁহার বিয়োগে অনেকদিন শোকাভিভূত হইয়া রইলেন, শেষে অমাত্যদিগের পরামর্শে তদীয় ঔদ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পাদনপূর্বক অপর এক পত্নীকে অগ্রমহিষীর পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। নবীনা মহিষীও দশরথের প্রিয়া ও মনোজ্ঞা হইলেন কিয়দ্দিনের মধ্যে গর্ভধারণ করিলেন এবং গর্ভসংস্কারাদি লাভ করিয়া যথাকালে এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রের নাম হইলো ভরতকুমার। রাজা পুত্রস্নেহের আবেগে একদিন মহিষীকে বলিলেন, ''প্রিয়ে, আমি তোমায় একটা বর দিব; কি বর লইবে, বল।'' মহিষী বলিলেন, ''মহারাজ, আপনার, আপনার বর দাসীর শিরোধার্য্য; কি বর চাই, তাহা বলিব না।''

ক্রমে ভরতকুমারে বয়স সাত হইল। তখন মহিষী একদিন দশরথের নিকট গিয়া বলিলেন, ''মহারাজ, আপনি আমার পুত্রকে একটি বর দিবেন বলিয়াছিলেন; এখন সেই অঙ্গীকার পালন করুন।'' রাজা বলিলেন, ''কি বর চাও, বল।'' ''স্বামিন আমার পুত্রকে রাজপদ দিন।'' রাজা অঙ্গুলি ছেটন করিয়া বলিলেন, ''নিপাত যাও বৃষলি; আমার প্রজ্বলিত অগ্নিখন্ডসম অপর দুই পুত্র বর্তমান; তুমি কি তাহাদিগকে মারিয়ে ফেলিতে চাও যে, নিজের পুত্রকে রাজ্য দিবার কথা বলিতেছ? মহিষী রাজার তর্জ্জনে ভীত হইয়া নিজের সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে (শ্রীগর্ভে) চলিয়া গেলেন; কিন্তু অতঃপর পুনঃ পুনঃ রাজার নিকট ঐ প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাকে উক্ত বর দিলেন না বটে কিন্তু চিন্তা করিতে লাগিলেন, ''রমণীগণ অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদোহী; মহিষী কোন কূটপত্র লেখাইয়া কিংবা নিজের দূরভিসন্ধিসাধনার্থ উৎকোচ দিয়া আমার পুত্রদিগের প্রাণ বধ করাইতে পারেন।'' অতঃপর তিনি প্রথম পুত্রদ্বয়কে ডাকাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন, এবং বলিলেন, ''বৎসগণ এখানে থাকিলে তোমাদের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। তোমরা কোন সামন্তরাজ্যে কিংবা বনে গিয়া বাস কর। যখন আমার দেহ শ্মশানে ভস্মীভুত হইবে, তখন ফিরিয়া আসিয়া পিতৃপৈতামহিক রাজ্য গ্রহণ করিও।'' পুত্রদ্বয়কে এই কথা বলিয়া দশরথ দৈবজ্ঞ ডাকাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, ''বলুন ত, আমি আর কতকাল বাঁচিব?'' তাঁহারা বলিলেন,

‘‘মহারাজ আরও দ্বাদশ বৎসর জীবিত থাকিবেন।’’ তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, ‘‘ বৎসগণ, তোমরা দ্বাদশবৎসরান্তে প্রত্যাগমণ করিয়া রাজচ্ছত্র গ্রহন করিও।’’ কুমারদ্বয় ‘‘যে আজ্ঞা’’ বলিয়া পিতার চরণবন্দনাপূর্বক সাশ্রুনয়নে প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন। তখন সীতা দেবী বলিলেন, আমিও সহোদরদিগের সহিত যাইব’’, এবং তিনিও পিতাকে প্রণাম করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহাদিগের অনুগমন করিলেন। যখন ইহারা তিনজনে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন, তখন সহস্র নরনারী তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তাঁহারা ইহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন, এবং কিয়দ্দিন পরে হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া সেখানে উদকসম্পল, সুলভফলমূল কোন স্থানে আশ্রমনির্মাণপূর্বক বন্য ফলমূলে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন।

লক্ষন পন্ডিত ও সীতাদেবী রামপন্ডিতকে বলিলেন, ‘‘আপনি আমাদের পিতৃস্থানীয়; আপনি আশ্রমে অবস্থিতি করিবেন; আমরা আপনার আহারার্থ বণ্য ফলাদি সংগ্রহ করিয়া আনিব।’’ রামপন্ডিত ইহাতে সম্মত হইলেন। তিনি তদবিধি আশ্রমে থাকিতেন, এবং লক্ষণ, সীতা যে ফলমূল সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, তাহা আহার করিতেন। এদিকে মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া নবমবর্ষে দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পন্ন হইলে ভরত জননী বলিলেন, ‘‘ভরতেরই মস্তকোপরি রাজচ্ছত্র ধারণ করিতে হইবে।’’ কিন্তু অমাত্যেরা ভরতকে রাজ্য দিলেন না; তাঁহারা বলিলেন, ‘‘যাহারা ছত্রের অধিপতি; তাহারা অরণ্যে অবস্থিতি করিতেছেন।’’ তাঁহারা ভরতকে ছত্র দিলেন না। তখন ভরত স্থির করিলেন, ‘‘আমি বনে গিয়া অগ্রজ রামপন্ডিতকে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে রাজচ্ছত্র দিব।’’ তিনি পঞ্চবিধ রাজচিহ্ন লইয়া ও চতুরঙ্গ বলে পরিবৃত হইয়া সেই বনে উপনীত হইলেন, এবং অবিদূরে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্বক লক্ষণ ও সীতার অনুপস্থিতিকালে কতিপয় অমাত্যসহ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেখানে দেখতে পাইলেন, পীতকাঞ্চনবর্ণাভ রামপন্ডিত নিঃশঙ্কমনে পরমসুখে আশ্রমদ্বারে উপবিষ্ট আছেন। ভরত অভিভাষণপূর্বক তাঁহার নিকটবর্তী হইলেন, এবং একান্তে অবস্থিত হইয়া দশরথের পরলোক প্রাপ্তির সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর তিনি অমাত্যদিগের সহিত রামের পাদমূলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রামপন্ডিত কিন্তু শোক করিলেন না, ক্রন্দনও করিলেন না; তাঁহার কিঞ্চিৎমাত্র ইন্দ্রিয়বিকার ঘটিল না।

ক্রন্দনান্তে ভরত রামের পার্শ্বে উপবেশ করিয়া রহিলেন। এদিকে সায়ংকালে লক্ষণ ও সীতা বন্য ফলমূল আহরণপূর্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। তদ্দর্শনে রামপন্ডিত ভাবিতে লাগিলেন, ‘‘ইহারা তরুনবয়স্ক, এখনও আমার মত পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করে নাই; যদি অকস্মাৎ বলি যে, পিতার মৃত্যু হইয়াছে, তাহা হইলে হয় ত শোকবেগধারণে অসমর্থ হইয়া ইহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইবে; অতএব কোনো উপায়ে ইহাদিগকে জলমধ্যে অবতরণ করাইয়া এই দুঃসংবাদ শুনাইতে হইবে।’’ অতঃপর পুরোভাগে এক জলাশয় দেখিতে পাইয়া তিনি বলিলেন, ‘‘তোমরা আজ বড় বিলম্ব করিয়া আসিয়াছ; আমি তোমাদিগকে তজ্জন্য দন্ড দিতেছি- তোমরা এই জলে অবতরণ করিয়া দাঁড়াইয়া থাক।’’ অতঃপর তিনি এই গাথার্দ্ধ বলিলেন :

১ (ক) লক্ষন সীতারে লয়ে, অবতরি জলমাঝে, দুইজনে থাক দাঁড়াইয়া;

লক্ষণ ও সীতা এই কথা শুনিবামাত্র জলে অবতরণ করিয়া রহিলেন। তখন রামপন্ডিত তাঁহাদিগকে উক্ত দুঃসংবাদ দিবার নিমিত্ত গাথার অপরার্দ্ধ বলিলেন :

(খ) বলিল ভরত আসি, গিয়াছেন স্বর্গপুরে দশরথ জীবন ত্যজিয়া।

লক্ষণ ও সীতা পিতার বিয়োগবার্তা শ্রবণ করিয়া মুর্চ্ছিত হইলেন। চেতনালাভের পর তাঁহারা উপর্যপুরি তিনবার বিসংজ্ঞ হইলে অমাত্যেরা তাঁহাদিগকে উত্তোলন পূর্বক স্থলে লইয়া আসিলেন; এবং সেখানে তাঁহাদের চৈতন্য লাভের পর সকলে বসিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন ভরতকুমার চিন্তা করিতে লাগিলেন, ‘আমার ভ্রাতা লক্ষণকুমার ও ভগিনী সীতাদেবী পিতার মরণ সংবাদ শুনিয়া শোকবেগধারণে অসমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু রামপন্ডিত শোকাভিভূত হন নাই, বিলাপ

করিতেছেন না! তাঁহার শোক না করিবার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিতেছি।' অতঃপর তিনি দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :

২ বল রাম, কোন বলে হ'য়ে বলিয়ান শোককালে শোকাতুর নহে তব প্রাণ?
পিতার বিয়োগ বার্তা করিলে শ্রবণ, তথাপি না অভিভূতে দুঃখ তব মন!

রামপন্ডিত নিজের অশোকের কারণ বুঝাইবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :

৩ দিবা রাত্র উচ্চৈঃস্বরে করিয়া ক্রন্দন যাহারে রক্ষিতে কেহ পারে না কখন,
তার জন্য বৃথা শোকে হয় কি কাতর বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান নর?

৪ বাল, বৃদ্ধ, ধনবান, অতি দীন হীন, মূর্খ, বিজ্ঞ সকলেই মৃত্যুর অধীন।

৫ তরুশাখে ফল যবে পরিপক্ক হয়, অনুক্ষণ থাকে তার পতনের ভয়।
জীবগণ, সেইরূপ জন্ম লাভ করি মৃত্যুভয়ে দিবানিশি কাঁপে থরথরি।

৬ ঊষাকালে যাহাদের পাই দশরথ না হেরি সায়াহ্নকালে তার বহুজন;
ইহাদের (ও) বহুজন ঊষা না ফিরিতে অদৃশ্য হইয়া যায় যমের কুক্ষিতে।

৭ বৃথাশোকে অভিভূত হ'য়ে মূঢ় জন আত্মার অশেষ ক্লেশ করে উৎপাদন;
লভিত ইহাতে যদি সুফল তাহারা, পন্ডিতেও শোকবেগে হ'ত আত্মহারা।

৮ শোকেতে শরীর ক্ষয়, লাভ নাহি আর; বিবর্ণ, বিশুষ্ক দেহ, অস্থিচর্মসার।
শোকে কি করিতে পারে মৃতসঞ্জীবন? কি ফল পাইব তবে করিয়া ক্রন্দন?

৯ বারির সাহায্যে যথা গৃহ দহ্যমান সযতনে গৃহিগণ কররে নির্বান
ধীর শাস্ত্রজ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষন তেমতি শোকেরে সদা করেন দমন।
বায়ুবেগে তুলারাশি উড়ি যথা যায়, প্রজ্ঞাবলে শোক তথা শীঘ্র লয় পায়।

১০ কর্ম্মবশে যাতায়াত করে জীবগণ; কেহ মরে, কেহ করে জনম-গ্রহণ।
এই মাতা, পিতা, এই সোদর আমার, হেনজ্ঞানে সুখে মগ্ন নিখিল সংসার।

১১ গিয়াছেন স্বর্গে পিতা, কি কাজ ক্রন্দনে?
লইব পিতার স্থান, দীনেরে কবির দান
রাখিব মানীর মান, ভাবিয়াছি মনে।
জ্ঞাতিজনে সাবধানে করিব পালন,
পুষিব যতনে আর যত পরিজন।

১২ সুধীর, শাস্ত্রজ্ঞ লোকে করেন দর্শন ইহলোকে, পরলোকে প্রভেদ কেমন।
যত বড় শোক কেনো উপস্থিত হয়, দহিতে পারে না কভু তাদের হৃদয়।

উল্লেখিত গাথাগুলি দ্বারা রামপন্ডিত সংসারের অনিত্যত্ব বুঝাইয়া দিলেন। সমবেত জনগণ রামপন্ডিতের অনিত্যত্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ শোকমুক্ত হইলেন। অনন্তর ভরতকুমার রামের চরণবন্দনাপূর্বক বলিলেন, ''চলুন, এখন বারাণসীতে প্রতিগমন করুন।'' রাম বলিলেন, ''ভাই, লক্ষণ ও সীতাকে লইয়া যাও এবং ইহাদের সহিত রাজ্য শাসন কর।'' ''না, দাদা! আপনাকেই রাজ্য গ্রহণ করিতে হইবে; ''ভাই, বাবা বলিয়াছিলেন, দ্বাদশ বৎসর পরে আসিয়া রাজ্য লইবে; এখন ফিরিলে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন হইবে। আরও তিন বৎসর যাউক; তাহার পরে আমি ফিরিব।'' ''এতদিন কে রাজ্য করিবে?'' ''তুমি করিবে।'' ''আমি করিব না।'' ''তবে, আমি যতদিন না ফিরি, ততদিন এই পাদুকা রাজ্য করিবে।'' ইহা বলিয়া রাম নিজের তৃণনির্মিত পাদুকাদ্বয় খুলিয়া ভরতের হস্তে দিলেন। অতঃপর ভরত, লক্ষণ, সীতা ঐ পাদুকা লইয়া রামের নিকট বিদায় গ্রহন করিলেন এবং সহস্র অনুচরে পরিবৃত হইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন। রামের পাদুকাই তিন বৎসর বারাণসীরাজ্যের শাসনকার্য নির্বাহ করিয়াছিল। বিবাদ নিস্পত্তি কালে

অমাত্যেরা উহা সিংহাসনের উপর রাখিয়া দিতেন; যদি নিস্পত্তি ন্যায়বিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে পাদুকাদ্বয় পরস্পরকে আঘাত করিত; তাহা দেখিয়া অমাত্যেরা সেই বিবাদের প্রতিবিচার করিতেন। নিস্পত্তি ন্যায়সঙ্গত হইলে পাদুকাদ্বয় নিঃস্পন্দভাবে থাকিত।
তিন বৎসর অতীত হইলে রামপন্ডিত অরণ্য হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক বারাণসীর উদ্যানে উপনীত হইলেন। কুমারদ্বয় তাঁহার আগমনবার্তা শুনিয়া অমাত্যগণসহ উদ্যানে গমন করিলেন এবং সীতাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করিয়া উভয়ের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত করিলেন। কৃতাভিষেক মহাসত্ত্ব রাম অলঙ্কৃত রথে আরোহণপূর্বক পুরবাসীগণসহ নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং পুর প্রদক্ষিন করিয়া সুচন্দ্র নামক প্রাসাদের উর্দ্ধতমতলে অধিরোহণ করিলেন। অতঃপর তিনি ষোড়শসহস্র বৎসর যথাধর্ম রাজ্য করিয়া সুরলোকবাসীদিগের সংখ্যাবর্দ্ধনার্থ ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

অনার্য রামায়ণ উপাখ্যান : এখানে দ্রাবিড় আমাদের জাতীয় পরিচয়; চক্র হয়ে সিন্ধু আমাদের ধর্ম; আর রাবণ নায়ক। রাম এখানে বহিরাগত আর্যগণ কতৃক বিভ্রান্ত এক যুবক। কাহিনীটি এরকম- ‘‘পূর্বকল্পে বা প্রাক সত্যযুগে(*শ্রী উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের মতে,সত্যযুগ হচ্ছে- ৮০০০ খ্রীষ্টপূর্ব হতে ৭৫০০ খ্রীষ্টপূর্বের মধ্যে যখন আর্যনামীয় শ্বেতকায় একটি জাতি বাইরে থেকে উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তখন এ দেশে দ্রাবিড় ও অন্যান্য কয়েকটি জাতি (কালো চামড়ার মানুষ) বাস করতো। আর্যরা ক্রমিকভাবে রাজ্য ও প্রাধান্য বিস্তার করতে করতে ৬১০০ খ্রীষ্টপূর্বের কাছাকাছি সময়ে পূর্বে মিথিলা এবং দক্ষিণে গোদাবরী নদী ও সেখান থেকে সিংহলে নিজেদের ধর্মমত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাদি এবং ভাষা প্রতিষ্ঠা করেছিলো। এই দীর্ঘ সময় বুঝানো হয়েছে।*) ভারতবর্ষে রাজতন্ত্রশাসন প্রণালী (Monarchy), বর্ণভেদ, অনুলোম মূলক (*বিবাহের ব্যাপারে আর্যদের কতকগুলো বিশেষ প্রথা। পুরোহিত সম্প্রদায়ের যুবকগণ নিজেদের ইচ্ছেমত যে কোন বর্ণের কন্যা, রাজন্য সম্প্রদায়ের যুবকগণ পুরোহিত ভিন্ন অন্য যেকোন বর্ণের, বিশ সম্প্রদায়ের যুবকগণ শুধু নিজ সম্প্রদায়ের এবং আর্যীকৃত অনার্যদের কন্যা এবং আর্যীকৃত অনার্যরা শুধু নিজ বর্ণের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিতো। একেই অনুলোম বলে।*) সমাজ ব্যবস্থা, আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ ও জড়শক্তির উপাসনা সম্বলিত ‘ইন্দ্র-পূঁজা’ (সূর্য পূঁজা) ইত্যাদি বিদ্যমান ছিল এবং এই ধরনের ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক অবস্থা ৬১০০-৬০০০ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছিলো। এই সময়ে মালবে একজন, সিংহলদ্বীপে একজন এবং বারাণসী বা অযোধ্যায় একজন, এই তিন স্থানে তিন জন ব্যক্তি আবির্ভুত হইয়া পূর্বকল্পীয় রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্ম ব্যবস্থা সমুহকে সম্পূর্ণ দূরীভূত করিয়া একটি উৎকৃষ্ট ধর্মমতের প্রভাবে নতুন জগতের সৃষ্টি করেন। এই তিন ব্যক্তির মধ্যে দুই জন পুরুষ এবং একজন মহিলা। যিনি মালব দেশে জন্মগ্রহণ করেন তার পিতৃপ্রদত্ত নাম জানা যায় না, তবে ধর্মপ্রবর্তক হিসেবে খ্যাতি লাভের পর অনুবর্তীরা তাকে নানা উপাধিতে ভুষিত করেন, এর মধ্যে ‘ভরত’- উপাধিই বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল। ইনি আর্যজাতীয় এক রাজন্য পরিবারে জন্মগ্রহন করিলেও ইহার গাত্রবর্ণ ছিল ‘শ্বেত’ (white) বা ‘শুভ্র’। বারাণসী বা অযোধ্যায় যিনি জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন মহিলা। ইনিও এক আর্যরাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহার গাত্র বর্ণ ছিলো শ্বেত বা শুভ্র। অনুবর্তী মহলে ইহার অনেকগুলি নাম বা উপাধি প্রচলিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ‘সীতা’ এই নাম বা উপাধিই সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। যিনি সিংহলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন-পূর্বকল্পীয় আর্যসমাজ এবং ‘ক্রেতা পরবর্তী’ ব্রাহ্ম ণ্যধর্মী সমাজ ব্যবস্থা অনুসারে তাহাকে ‘হীনকুলজাত’ বলা যায়। এক আর্যীকৃত (*ভারতীয় অশ্বেতকায় জাতির মধ্যে যারা আর্যদের ভাষা, ধর্মগ্রহন করেছিল, সমাজে তাদের জন্যে নিম্নতম স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল-শ্রী উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, পৃষ্ঠা-৮৫।*) অনার্য জনকের ওরসে এবং শ্বেতকায় পুরোহিত কন্যার গর্ভে ইহার জন্ম হইয়াছিল। ইহার গাত্র বর্ণ ছিল ‘কৃষ্ণ’ বা ‘শ্বেম’। অনুবর্তী মহলে ইহারও অসংখ্য নাম বা উপাধি প্রচলিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ‘শম্বর’ বা ‘শম্ব’- এই নাম বা উপাধিই আদিতম ছিল বলিয়া ধারণা করিতে হয়।
এই তিন জনের মধ্যে মালবদেশীয় ভরত বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সিংহল দ্বীপের শম্বর (শম্ব) বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন - এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। ভরত উত্তর ভারতে তৎকালীন আর্যগনের আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ, বর্ণভেদ এবং অনুলোমের বিরুদ্ধমতবাদ সমূহ বিশেষত ‘ব্রহ্মবাদ’ প্রচার করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সিংহলদেশীয় শম্বর সম্ভবত কিছুকাল যাবৎ ভরতে শিষ্যরূপে অবস্থানপূর্বক তাহার নিকট ব্রহ্মবাদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি সিংহলে প্রত্যাবর্তন করিলে একটি

অত্যুত্তম ‘ধর্মমত’ তাহার নিকট প্রতিভাত হয় এবং তিনি তাহা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই ধর্মমতেরও বহুনাম পরবর্তীকালে জনগণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ‘চক্রধর্ম’ নামটিই বহুপুরাতন ও প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল। এই চক্রধর্মের বহুমতবাদের মধ্যে বিশ্বজনকজননীতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, চতুদর্শনভূবনতত্ত্ব এবং ‘অমৃতত্ত্ব’ (বা জীবদ্দশায় দেবত্ব লাভই) প্রধানতম মতবাদ ছিল এবং জীবনভেদ, গুনকর্মভেদ, জীবনযজ্ঞের মতবাদ প্রভৃতি কতকগুলি আনুষাঙ্গিক মতবাদ এবং সাংখ্যযোগ-সাধন প্রনালী উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নারীর কোন কোন বিষয়ে পুরুষের সমান এবং কোন কোন বিষয়ে বিশেষ অধিকার এই ধর্মমতে স্বীকৃত হইত। শম্বর সিংহল দ্বীপেই প্রথমত এই ধর্মমত প্রচার করেন। পরে গোদাবরী নদীর তীরেও তাঁহার একটি ধর্মপ্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া ছিল বলিয়ে ধারণা করা যায়। ভরত সর্বপ্রথম যে ব্রহ্মবাদ প্রচার করিয়াছিলেন তাহ কতকটা ‘দার্শনিক মতবাদ’ হিসেবে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল কিন্তু শম্বর প্রচারিত ‘চক্রাধর্ম’ অনেকটা পূর্ণাঙ্গ ‘ধর্মমত’ বা ‘জীবনাদর্শ’ হিসেবে প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং তাহার বিশ্বজনকজননীতত্ত্বের মধ্যেই ব্রহ্মবাদও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শম্বর প্রবর্তিত ধর্মমত অতি অল্পদিনের মধ্যে সমগ্র ভারতে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং দলে দলে যুবক যুবতীরা ও নিম্নবর্ণীয় যুবকগণ তাহার ধর্মমতে দীক্ষাগ্রহন করিতে থাকেন। ইহার ফলে তৎকালীন শ্বেতকায় আর্যজাতি বিশেষত অভিজাত পুরোহিত ও রাজন্যসম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন। শম্বরের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে অযোধ্যার (অথবা বারাণসীর) রাজ পরিবার হইতে এক রাজকুমার (সম্ভবত তাঁহার নাম ছিল ‘রাম’) এবং তাঁহার ভগিনী ‘সীতা’- এই দুই জনে দক্ষিন ভারতে গোদাবরী নদীতীরে উপস্থিত হইয়া শম্বরের নবধর্মমতে দীক্ষাগ্রহন করেন এবং শিষ্যশিষ্যা রূপে আশ্রমে অবস্থান করিতে থাকেন। ‘সীতা’ শম্বরের ধর্মমতে দীক্ষাগ্রহন করার ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের নারী মহলে অভুতপূর্ব সাড়া পড়িয়া যায় এবং আর্যজাতীয় সহস্র সহস্র যুবতী, কন্যাগণ, বিধবা এমন কি সধবা স্ত্রীগণ আপনাপন পিতামাতা, স্বামী-শ্বশুর, অভিভাবক- অভিভাবিকা প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া শম্বরের ধর্মমতে দীক্ষাগ্রহনপূর্বক নতুন ধরনের জীবনযাপনে প্রবৃত্ত হন। এই কারণে তৎকালীন আর্যজাতীয় অভিজাতগণ বিশেষতঃ পুরোহিতগণ শম্বর ওসীতার প্রতি বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ এবং বিরূপ হন। এতদ্ভিন্ন শম্বর প্রবর্তিত ‘জীবনযজ্ঞের’ মতবাদের ফলে তৎকালীন আর্যগণের আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ ও ইন্দ্রোপসনা লোপ পাইতে থাকে। শম্বর প্রবর্তিত চক্রধর্মের প্রভাবে নিজেদের ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থাদিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে দেখিয়া আর্যপুরোহিত সম্প্রদায় এরূপ ধরনের ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন যে তাঁহার মৃত্যু ঘটাইবার ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা করেন কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন না।

ইতিমধ্যে শম্বরের ‘শিষ্য’ তথা সীতা ভ্রাতা ‘রাম’ কিছুকাল তাঁহার শিষ্যত্ব করার পর শম্বরের প্রতি বিরূপ হইয়া তাঁহাকে ত্যাগপূর্বক শম্বর-শত্রু আর্যপুরোহিতগণের দলে যোগাদান করেন। যে যে কারণে ‘রাম’ স্বীয় গুরু শম্বরের প্রতি বীতরাগ হইয়াছিলেন তন্মধ্যে শম্বর ও সীতার সম্পর্ক (Relation) অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। কুমারী ‘সীতা’ শম্বরের ধর্মমতে দীক্ষাগ্রহণের পর তাঁহার ‘শিষ্যা’ হইতে ক্রমশঃ তাঁহার ‘প্রিয়ার’ পর্যায়ে উন্নীত হন এবং পরিশেষে উভয়ের মধ্যে এরূপ ‘বিশেষ হৃদ্যতা’ এবং ‘ধর্মীয় মতবাদ সমূহের আদান-প্রদান ব্যবস্থা’ গড়িয়া উঠে যাহাতে সীতা শম্বরের ‘সাধনসঙ্গিনী’ রূপে পদবাচ্য হন। শম্বরের নিকট সীতা দশ বা বারো বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন-এ রূপ প্রমান পাওয়া যায়। এই কয়েক বৎসরের অধিকাংশই দুই জনে সিংহল দ্বীপে অবস্থান করিতেন- তবে মাঝে মাঝে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে গোদাবরী নদীর তীরেও তাঁহারা সাময়িকভাবে কাটাইতেন বলিয়া মনে হয়। শম্বর অধিকাংশ সময়ই যোগমগ্ন থাকিতেন এবং সীতা ভিন্ন অন্য কেহ শম্বরের সাক্ষাৎ পাইতো নাহ। যখনই ধর্মসংক্রান্ত কোনো মতবাদ বা বিষয় শম্বরের নিকট ‘প্রতিভাত’ হইত তখনই তিনি তাহা সীতার নিকট ব্যক্ত করিতেন এবং সীতা তাহা অন্যান্য শিষ্য-শিষ্যাদের গোচর করিতেন। আবশ্য এই সময় সীতার চিত্তেও ধর্ম সংক্রান্ত নতুন নতুন ‘সত্য’ প্রতিভাত হইতে থাকে এবং তাদ্দারা তিনি ‘চক্রধর্ম’কে সমৃদ্ধ করিতে থাকেন। শম্বর ও সীতার মধ্যে এই ধরনের সম্পর্ক গড়িয়া ওঠাতেই সীতা ভ্রাতা ‘রাম’ শম্বরকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার শত্রুপক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করা যায়।

এদিকে সীতার ভ্রাতা রামকে নিজেদের দলে পাইয়া আর্যজাতীয় পুরোহিত সম্প্রদায় নতুন করিয়া শম্বরকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চালাইতে আরম্ভ করেন। শম্বরের সহিত সীতা প্রথম সাক্ষাৎ হইবার দশ কি বারো বৎসর পর একবার যখন তাঁহারা সিংহল হইতে গোদাবরী নদীর তীরস্থ তাঁহাদের ধর্মপ্রচারকেন্দ্রে প্রত্যাবর্তন পূর্বক অবস্থান করিতেছিলেন- তখন আর্যপুরোহিত সম্প্রদায় কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া; 'রাম' গোপনে শম্বরের যোগ সাধন কক্ষে প্রবেশপূর্বক 'একাকী অবস্থানকারী' যোগমগ্ন শম্বরের শিরচ্ছেদ করিয়া পালাইয়া আসেন। নিধনকালে শম্বরের বয়স ৩২ কিংবা ৩৩ হইয়াছিল। সম্ভবত ১৯/২০ বৎসরকালে তিনি সর্বপ্রথম 'চক্রধর্ম' প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং বারো বা চৌদ্দ বৎসর ধর্মপ্রচারের পর তৎকালীন আর্যপুরোহিতগণের কোপে পড়িয়া আপন শিষ্যের হস্তে তিনি অকালে জীবনদান করিয়াছিলেন। এই সময় লঙ্কাদ্বীপের যিনি রাজা বা অধিপতি ছিলেন তিনি সম্পর্কে শম্বরের মাতুল বা মামা হইতেন। তাহার নাম 'রাবণ' ছিল বলিয়া ধারণা করা হয়। তিনি আর্য জাতীয় পুরোহিত সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিলেও 'রাজা' হইয়াছিলেন এবং একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন বলিয়া মনে হয়; কারণ তাঁহার শ্বেতকায় ভগিনী ছিলেন শম্বরের জননী এবং কৃষ্ণকায় আর্যীকৃত এক অনার্য যুবকের সহিত রাবণই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন এরূপ বলে মনে হয়। গোদাবরী তীরবাসী আর্যজাতীয় পুরোহিত সম্প্রদায় কর্তৃক তাঁহার ভাগিনেয় শম্বর নিহত হইয়াছেন এই সংবাদ শ্রবণে রাবণ পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রতি মহাক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহাদিগকে শাস্তিদানের চেষ্টা করেন। এই ব্যাপারে লঙ্কাধিপতি রাবণের সহিত সংগ্রামে ভারতীয় আর্যজাতীয় রাজগণ পুরোহিত সম্প্রদায়ের সহায়তা করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে শেষমেশ রাবণ 'পরাজিত' ও 'নিহত' হইয়াছিলেন। ফলে শম্বরানুবর্তী চক্রধর্মালম্বীরা এবং 'সীতা' ও তাঁহার অনুবর্তিনীরা সকলেই আর্যপুরোহিত ও রাজন্যসম্প্রদায়ের করায়ত্ব হন। সেকালের রূপকাহিনীসমূহের গুঢ়ার্থ এবং অন্যান্য বিষয় হইতে যতদূর জানা যায়-তাহাতে ধারণা করিতে হয় যে, তৎকালীন আর্যপুরোহিত সম্প্রদায় শম্বরের সাধনাসঙ্গিনী সীতাকে এবং তাঁহার অনুবর্তিনী নারীদিগের অনেককে যজ্ঞাগ্নি মধ্যে নিক্ষেপপূর্বক জীবনত দগ্ধ করিয়া নিহত করিয়াছিলেন।'' (***তথ্যসুত্র : শ্রী উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস; ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের পুরাবৃত্ত- প্রথম খন্ড (৮০০০ খ্রীষ্টপূর্ব হতে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত), বি সরকার এন্ড কোং, কলিকাতা, ১৯৫০, পৃষ্ঠা-৮৬-৯০***) এই সমুদয় কাহিনী উপাখ্যান, গালগল্প না ইতিহাস তা বিচারের দায়িত্ব গবেষকদের।

রামায়ণের ঐতিহাসিকতা অনুসন্ধানে : প্রায়ই অনেকে প্রশ্ন তোলেন, রামায়ণ কি নিছক কল্পনা নির্ভর কাহিনী, না তার অন্তর্লোকে কিছুটা হলেও আছে ইতিহাসের কাঠামো? যদি সত্য হয় তবে রামায়ণের কাহিনী কোন সময়ের ঘটনা? আবার আরও কিছু প্রশ্ন উঠে আসে, রামায়ণ কি ভারতীয় মিথ নির্ভর কাব্য, না কি বিদেশী কাব্যের প্রভাব আছে? ইত্যাদি। আসুন, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজি। তবে এর আগে বলে নেয়া ভাল যে, আর্যরা(আর্য হচ্ছে একটি ভাষাগোষ্ঠীর নাম। সংস্কৃত, ল্যাটিন ও গ্রীক- প্রধানত এই তিনটিই হচ্ছে আর্য ভাষা। বর্তমানে ব্যাপকভাবে ভুলপ্রয়োগের ফলে আর্য, আর্যজাতি, আর্যভাষী-সব একাকার হয়ে গেছে।) ইরানীয় অঞ্চল থেকে ধীরে ধীরে ভারতীয় ভুখন্ডে প্রবেশ করেছেন। তবে এই আর্যদের এ অঞ্চলের প্রবেশের সময়কাল নিয়ে কিছুটা দ্বিধা দ্বন্ধ রয়েছে ঐতিহাসিকদের মধ্যে। তবে এক ব্যাপারে এক মত যে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ এর পর ধীরে ধীরে আর্যভাষীদের এ অঞ্চলে প্রবেশ ঘটেছে। খ্রীষ্টপূর্ব ১৭০০- ১৫০০ শতাব্দীর তিন চারশো বছর ধরে আর্যভাষীরা পারস্য অঞ্চল (অন্য নাম ইরান) থেকে উত্তর ভারতে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে দক্ষিনমুখে ছড়িয়ে পড়ে। আর্যরা পশুশিকার জীবি ছিল, এ অঞ্চলে এসেই কৃষিজীবি দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর সাথে পরিচিতি ঘটে এবং ধীরে ধীরে কৃষি সভ্যতার সাথে মিশে যায়। অনেকেই দাবি করেন, উত্তর ভারতের আর্যভাষী জনপদগুলির মানুষেরা ধীরে ধীরে দক্ষিনে এগিয়ে গিয়ে অষ্ট্রিক এবং দ্রাবিড় জনজাতিগুলীর কোনটাকে বশীভুত করে, কোনটিকে পরাস্ত করে রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার কাহিনীই রামায়নে বিধৃত করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাওতালী লোকপুরান- কাহিনীর মধ্যে একটি 'কুদুম' বা 'ধাঁধা' আছে, যা বাংলায় অনুবাদ করলে পাওয়া যায়- ''রাম ছিল। হরধনু ভেঙে সীতাকে ঘরে আনল। তারপর রাবন তাকে চুরি করে নিয়ে গেল। সীতাকে পরে উদ্ধার করল রাম। তখন হল অগ্নীপরীক্ষা। এরপরে সীতার কোলে জন্মাল লব-কুশ।

রাম তাদেরকে ঘরে আনল। কিন্তু সীতা লুকালো মাটির তলায়।''....

এই কাহিনীর মধ্যে যে ঐতিহাসিক স্তর-বিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে, তা হল এই রকম :-

রাম = রা - (অর্থাৎ, জনপদের মানুষের রাজা)

রাবন = রা - বন (অর্থাৎ, বনের মানুষদের রাজা)

সীতা = লাঙলের ফাল, এবং হরধনু ভেঙে রাম সীতাকে লাভ করলেন, তার অর্থ শিকারজীবি মানুষ রূপান্তরিত হচ্ছে শিকারজীবীতে। জীবিকার উপজীব্য পরবর্তিত হচ্ছে, অর্থনীতির পরিভাষায় উৎপাদন-প্রকৃয়ার বদল ঘটছে। সীতা হরণের রূপকে বোঝানো হচ্ছে বনচর মানুষদেরও কৃষিকর্মের জ্ঞান আয়ত্ত করে ফেলার ইতিবৃত্ত। রাম-রাবণের সামাজিক স্তরের মানুষদের দ্বন্দ্ব এবং পরিনামে আদিবাসীদের পরাভবের কথা। আগ্নিপরীক্ষা হচ্ছে- বনে পড়ে থাকার ফলে লাঙলে জমা মর্চেকে পুড়িয়ে ফের ব্যবহার উপযোগী করা। লব-কুশের অর্থ কৃষিসভ্যতার দ্যোতনাবাহী এবং লব ও কুশ যথাক্রমে শস্য ও তৃণের প্রতীক। তাদেরকে ঘরে নিয়ে আসার অর্থ ফসল গোলায় তোলা। আর মাটির তলায় সীতার লুকিয়ে পড়ার অর্থ ফসলী মরশুমের পরিসমাপ্তিতে ধীরে ধীরে মাটির ওপরের হল কর্ষণের দাগগুলো মিলিয়ে যাওয়া। তাহলে অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে রামায়ণে ''**বানর**'' শব্দ দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে একটি লৌকিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন অধ্যাপক জয়ান্তনুজ বন্দোপাধ্যায় তাঁর ***মহাকাব্য ও মৌলবাদ*** গ্রন্থে **(পৃষ্ঠা-৩৫)**; তিনি বলেছেন, '' বন শব্দের সংগে ইক্ প্রত্যয় যোগে বান শব্দ হয়, যেমন বানপ্রস্থ প্রভৃতি শব্দে। তারপর বান শব্দের সংগে নর শব্দের সন্ধি করলে এবং সন্ধির একটি বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী পুনরাবৃত্তিমূলক অক্ষরের একটিকে বাদ দিলে, বনে বসবাস কারী মানুষ অর্থে বানর হতে পারে। এমনও সম্ভব যে বানর, ভালুক প্রভৃতি জীবজন্তু বিভিন্ন বনবাসী আদিম জাতির টোটেম কিংবা প্রতীকি জাতিচিহ্ন ছিল। পৃথিবীর সব দেশেই প্রাচীনকালে আদিম জাতি-উপজাতিদের মধ্যে এ ধরনের টোটেম কিংবা জাতি চিহ্ন প্রথা প্রচলিত ছিল। আর এই টোটেমের নামেই সেসব জাতি পরিচিত ছিল। যে প্রাচীন ভারতীয় সমাজের পটভূমিতে রামায়ণ-এর কাহিনী রচিত হয়েছিল, সেখানেও এই টোটেম প্রথা নিঃসন্দেহে প্রচলিত ছিল। আর বানর বলতে হয়ত এমন একটি বনবাসী আদিমজাতিকে বোঝাত, যার টোটেম ছিল বানর। রামায়ণের বর্ণনাতে দেখা দেখি বানরদের রাজধানী কিস্কিন্ধ্যা একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। সে কারণে বনবাসের প্রতিজ্ঞা ভংগের ভয়ে রাম নিজে সেখানে না গিয়ে লক্ষণকে পাঠিয়েছিলেন সুগ্রীবের সংগে আলোচনা করতে, এবং কিস্কিন্ধ্যার বাইরে বনের ভিতরে তার সংগে দেখা করাবার ব্যবস্থা করেছিলেন।'' - তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ঐসময় আর্থসামাজিক বিবর্তনকে অবলম্বন করে যে ভাবের সঞ্জাত হয়েছিল, রামায়ণ কাহিনী তার উপরেই বহির্কাঠামো (সুপার-স্ট্রাকচার) রূপে নির্মিত হয়েছে, কালক্রমে এমন একটা ব্যাখ্যা চলে আসছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে রামায়ণ তথা সকল মহাকাব্যেরই উৎস লুকিয়ে রয়েছে লৌকিক সাহিত্য প্রকরণের মধ্যে। প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ পল্লব সেনগুপ্তের মতে, '' আদিম মানুষের প্রথম সাহিত্য গড়ে উঠেছিল সৃষ্টিরহস্য, ব্রহ্মান্ডের আদি কারণ, প্রাণের উদ্ভবের সূত্র প্রভৃতি বিষয়ে তাদের বিচিত্র কল্পনায় গড়ে তোলা এবং অতিলৌকিক নানান সত্তা ও ঘটনাকে অবলম্বন করে কাহিনী তৈরি করার মাধ্যমে। এগুলিকে বিশেষজ্ঞরা নাম দিয়েছেন ''মিথ'' বা লোকপুরাণ বলে। প্রতিটি প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীরই নিজস্ব সাংস্কৃতিক ইতিহাস গড়ে উঠে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে এই সব মিথগুলির অবদান অপরিসীম। তাদের ঈশ্বর ও দেব কল্পনা, ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত আচার-বিধি ইত্যাদি বিষয় বিবর্তিত হবার উৎসে এবং প্রবাহে লুকিয়ে থাকে এই সব মিথগুলি (***ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা : উৎসের সন্ধানে, পৃষ্ঠা- ৯৪, ৯৫***)।'' তবুও ভাববাদের অপবিশ্বাসে বুঁদ হয়ে থাকা, রামকে দেবতা জ্ঞানে পুঁজো করা আর রামায়ণকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মান্য করা হিন্দু ধর্মালম্বীরা সমাজবিজ্ঞানের এই সকল প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অস্বীকার করে আসছেন যুগ যুগ ধরে। তাঁদের দাবি অনুসারে- ''রামায়ণের প্রতিটি ঘটনা সত্য এবং রাম এ অঞ্চলে জন্মগ্রহন করে রাক্ষস রাবণকে

হত্যা করে সীতাকে উদ্ধার করেন এবং রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।'' তাহলে প্রশ্ন আসে সেই সময়কাল কবে? কোন কোন ভাববাদী ঐতিহাসিক বা বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার সময়টা খ্রীষ্টপূর্ব ১২শ-১০ম শতাব্দী হতে পারে। আমরা আগেই জেনেছি, বাল্মীকির নামে প্রচলিত রামায়ণ রচনার বেশ কয়েকটি ধাপ ছিল। এবং প্রথম ধাপ শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী এবং খ্রীষ্টপুর্ব চতুর্থ শতাব্দী আর দশরথ জাতক রামায়ণতো আরও অনেক পুরাতন। যাই হোক, এখন যা অযোধ্যা শহর বলে সর্বজন স্বীকৃত, তাহার সন্নিহিত অঞ্চলসমূহসহ অযোধ্যার সমগ্র এলাকার ১৭টি সুপ্রাচীন ঢিবি খুঁড়ে তন্ন-তন্ন করে দেখা সত্ত্বেও, প্রত্নতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞরা ওখানে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের আগের কোনো জনবসতির প্রমাণ খুঁজে পাননি। দুটি মাত্র স্তরকে প্রাচীনবর্গীয় বলে তাঁরা চিহ্নিত করেছেন, যেখানে জৈন-মুর্তি মিলেছে; সেগুলি মৌর্যযুগের, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতক। এই সিদ্ধান্ত উত্তরপ্রদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন উপ-অধিকর্তা আর. সি. সিংহের। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণের প্রাক্তন মহাপরিচালক বি.বি.লাল তাঁর সঙ্গে অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষন করেছেন। তাঁর বক্তব্য, প্রাচীনতম স্তরগুলির বয়স আর একটু বেশি। তবে তিনি যে সব পালিশ করা মাটির তৈজসপত্র খুঁজে পেয়েছেন, পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, সেগুলি মোটামুটি শ্রী আর.সি.সিংহ নির্ধারিত সময়কালেরই **(সূত্র : ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা : উৎসের সন্ধানে, পৃষ্ঠা-১১৩)**। তবে শ্রদ্ধেয় গৌতম নিয়োগী তাঁর লিখিত ''***রাম জন্মভূমি বনাম বাবরি মসিজদ***'' প্রবন্ধে **(মাসিক অনিক, জুলাই ১৯৯০; সম্পাদনা- দীপঙ্কর চক্রবর্তী : রতন খাসনবিশ, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৩২।)** বলেছেন, 'খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকের পাওয়া পুরাতত্ত্বের সাক্ষ্য থেকে মনে হয়, অযোধ্যা অঞ্চলে কোন শহর ছিল না, জীবন যাত্রা ছিল ঢের বেশি আদিম। অথচ রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে অযোধ্যা শহরে অট্টালিকা ও প্রাসাদের বর্ণনা আছে।' শ্রদ্ধেয় গৌতম নিয়োগীর কথা মেনে নিলেও প্রশ্ন চলে আসে, 'রাম জন্মভুমি' রূপে প্রচলিত অযোধ্যা নগরীর পত্তনের চারশত বছর আগেই কি শ্রী রামচন্দ্র জন্মেছিলেন?!? তাছাড়া, প্রাচীন পুঁথি 'অঙ্গুত্তর নিকা'য় যে সব প্রাচীন নগরের নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবন্তী, সাকেত, কৌশাম্বী আর বারাণসী। তাতে অযোধ্যার নাম নেই। অন্যান্য নগরের মধ্যে যেমন বৈশালী, তক্ষশীলা, মথুরা, অহিচ্ছত্র, কুশিনারা, ইন্দ্রপ্রস্থ, উজ্জয়নী। এখানেও অযোধ্যার খোঁজ নেই। অথর্ববেদের (রচনাকাল নিয়ে বেশ মতবিরোধ আছে, তবে ধারণা করা হয় খ্রীষ্টপুর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পরে রচিত এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে প্রক্ষিপ্ত সংযোজন রয়েছে।) মধ্যে (১০.২.৩১-৩৩ শ্লোক) অবশ্য এক অযোধ্যার খোঁজ পাওয়া যায়। তবে সে অযোধ্যা হল 'দেব নগর' বা 'মিথিক্যাল সিটি'- ৮বৃত্ত, ৯ দ্বার ইত্যাদির মাধ্যমে একে মানব দেহের প্রতিকী ব্যঞ্জনায় চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং এ নিশ্চয় 'রামজন্মভূমি' নয়; কেননা মহাভারতে পরবর্তীতে রামপ্রসঙ্গ সন্নিবিষ্ট হলে অথর্ববেদে তা হবে না কেন? বৌদ্ধ তত্ত্বগ্রন্থ 'সমজুত্তনিকায়'তে এক অযোধ্যার উল্লেখ আছে বটে তবে সেটা স্পষ্টভাবেই গঙ্গাতীরের একটি শহরের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বর্তমান ফৈজাবাদে সরযুর তীরবর্তী অযোধ্যা,সেটি নয়। আর 'সমজুত্তনিকায়'-এর অযোধ্যার বয়স খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ বছর আগের নয়। হিউয়েন সাং তাঁর ভ্রমন বৃত্তান্তে এই গাঙ্গেয় অযোধ্যার কথাই লিখেছেন। তাছাড়া খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে রচিত 'বিষ্ণুস্মৃতি' গ্রন্থের ৮৫ অধ্যায়ে ৫২টি মূল তীর্থের তালিকায় অযোধ্যার নাম নেই। দেবতা রামের জন্মভুমি রূপে অযোধ্যার বিশেষ একটি মর্যাদা লাভ কি সম্ভাব্য ছিল না এই তীর্থ তালিকায়? তাই বোঝা যাচ্ছে, অযোধ্যা কোনওদিন একটি তীর্থরূপে গন্য হয় নি। স্বয়ং তুলসীদাস পর্যন্ত প্রয়াগ'কে তীর্থরাজ বলেছেন, কিন্তু 'অযোধ্যা' তাঁর কাছে নিতান্তই 'আওধপুরী'। অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্তের (পৃষ্ঠা-১১৪) মতে, 'গুপ্তযুগেই রামকে সরযু নদীর তীরের অযোধ্যা সঙ্গে জোড়া হয়েছে এবং ১৬ শতকের আগে রামকে নিয়ে কোন কাল্ট উত্তর প্রদেশে গড়ে উঠে নি।' এবং অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে হিন্দু মঠ মন্দির রামের নামে নির্মিত হতে থাকে। এখন দেখা যাক রামায়ণের লংকা নিয়ে ঐতিহাসিকদের অভিমত। অধ্যাপক জয়ান্তনুজ বন্দোপাধ্যায় **(পৃষ্ঠা-৩৫,৩৬)** বলেছেন,''পন্ডিতেরা এ বিষয়েও প্রায় ঐক্যমত পোষন করেন যে রামায়ণের লংকা বর্তমান শ্রীলংকা নয়। কর্ণাটক থেকে বেশী দূরে নয় এমন কোন বড় নদীর ধারে কল্পিত অথবা বাস্তব কোন পার্বত্য শহর। দশম-একাদশ শতাব্দীতে চোল সাম্রাজ্যের সংগে শ্রীলংকার বাণিজ্য শুরু হবার পর থেকেই ক্রমশ রামায়ণ এর লংকাকে শ্রীলংকার সংগে মিলিয়ে ফেলা হয়। কোন কোন রামায়ণ-এর পরবর্তী রূপায়নে সেভাবে ভাষা এবং ভাবের

রূপান্তর ঘটে (এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়ে দেখতে পারেন **j.l. Brockington, Righteous Rama : The Evolution of an Epic, Oxford university Press, Delhi**)।'' তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, **রাম কোন ঐতিহাসিক চরিত্র নয়**। সেটা বুঝেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, **'রাম জন্মভূমি প্রকৃতপক্ষে মহাকবি বাল্মীকির মনোভুমি ছাড়া আর কিছুই নয়।'**

এখন যে প্রশ্ন পাওয়া যায়, তা হলো রাম যদি অনতৈহাসিক চরিত্র হন তবে রামায়ণ উপাখ্যান বা মিথ এর উৎপত্তি স্থল কোথায়? এ ব্যাপারে দীপঙ্কর লাহড়ী তাঁর ''***বিলুপ্ত জনপদ : প্রচলিত কাহিনী***'' গ্রন্থে **(সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত, কলকাতা;১৯৯৪ পৃষ্ঠা- ১৯৫, ১৯৬)** বলেছেন, ''রামায়ন প্রসঙ্গে অত্যন্ত বিস্মিত হতে হয় এই কথা ভেবে যে, সম্রাট অশোকের (খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক) যুগে রাম নাম ধারী এমন কোন রাজা, জনপদ কিংবা রাজ্য এ দেশে নেই। রামচন্দ্রের প্রাধান্য ভারতের জনমানসে বহুকাল ধরে স্বীকৃত তাতে ব্যাপারটা বিস্ময়কর বটে। অথচ ভূমধ্যসাগরের উত্তর পূর্বাঞ্চলে রাম কিংবা র-যুক্ত শব্দে চিহ্নিত বহু জনপদ ও রাজার নাম রয়েছে যে গুলোর প্রাচীনত্ত্ব খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় সহস্রকের। যেমন, মিশরের ফারাও বিভিন্ন রামেসিস (সংখ্যা **১১** জন); ডেভিডের পূর্বপুরুষ, ইব্রাহিমের উত্তর পুরুষ হিষরোনের পুত্র ছেলে রাম জেরামিলের পুত্র এলিহুর পূর্বপুরুষ (বাইবেল); রামাল্লা (পশ্চিম জর্ডানে জেরুজালেমের উত্তরে শহর), রমৎগণ (তেল আবিবের কাছে শহর), রামাথেইম জোফিস (স্যামুয়েলের জন্মস্থান-বাইবেল), রামঃ বা রমঃ (Ramah বাইবেলে উক্ত শহর), রামথ লেহি (দক্ষিন পশ্চিম প্যালেষ্টাইনের অঞ্চল বিশেষ- এখানে স্যামসনের হাতে ফিলিষ্টাইনরা নিহত হয়), রামথ- নিজপে(জর্ডন নদীর পূর্ব অঞ্চল বিশেষ), র‍্যাবুয়া (Rambauillet- উত্তর ফ্রান্সের শহর)। এছাড়াও রম কিংবা রুপ উপসর্গযুক্ত শব্দ অনেক আছে যা ইউরোপের মধ্যভাগের ব্যক্তি, নগরী বা দেশ বোঝাতো। 'রোম নগরের প্রতিষ্ঠাতা রেমুলাস ও রেমাস নামক দুই যমজ ভ্রাতা। রোম বা রুমানিয়া দুটি সুন্দর উদাহরণ। জিপসিরাও নিজস্ব ভাষায় নিজেদের রম নামে পরিচিত দিতো।'' এছাড়া আমরা জানি যে, অসংখ্য দেব দেবী অধ্যুষিত প্রাচীন মিশরের প্রধান দেবতা ছিলেন সূর্যদেব **রা**, তিনি দেবকুলের রাজা। কেউ কেউ মনে করেন তাঁর একটি আদি নাম রাম (Ram)। রা বা রাম নামে সম্ভবত তিনিই ছিলেন মিশরের ব-দ্বীপ অঞ্চলের অতি প্রাচীন নগর হেলিয়োপলিসের অধীশ্বর এবং মিশর সহ সমগ্র পশ্চিম এশিয়া আর দক্ষিন-পূর্ব ইউরোপের বিশেষত গ্রীসের সর্বজনমান্য দেবত। সে আমলে সূর্যদেবের পুঁজোয় যে আন্তর্জাতিকতা দেখা গেছে তা নজীরবিহীন। এথেকে ধারণা করে থাকেন রাম ভারতের আগে মধ্যপ্রাচ্যের- অর্থাৎ মিশরের রাম এখন ভারতীয় ভগবান **(সুত্র : দ্বন্দ্বে ও দ্বৈরথে; পৃষ্ঠা-৮০)**। এবং সেই রাম আর্যদের মাধ্যমে ইরানীয় অঞ্চল দিয়ে আস্তে আস্তে উত্তর ভারতে প্রবেশ করেছে।

অনেক গবেষকই বলছেন, হোমার রচিত ইলিয়াড মহাকাব্যের সাথে রামায়ণের কাহিনীর মিল রয়েছে। উভয় মহাকাব্যেই এক দেশের রাজার স্ত্রীকে আরেক দেশের রাজার নিয়ে যাবার ঘটনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যদিও হেলেন অনেকটা স্বেচ্ছায় প্যারিসের সঙ্গে গিয়েছিলেন, আর সীতাকে রাবন জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। সমুদ্র পার হয়ে শত্রুর রাজার রাজধানী অবরোধও দুই কাহিনীরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যদিও ইলিয়াড-র জাহাজে করে সমুদ্র পার হবার জায়গায় রামায়ণ-এ ভারত ও লংকার মধ্যে সেতু বানাবার উদ্ভট কল্পনা রয়েছে। লংকার যুদ্ধের সাথে ট্রয়ের যুদ্ধের ও অনেক মিল রয়েছে। উভয় যুদ্ধ ক্ষেত্রেই দেবদেবী পরক্ষো ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। হোমারের ওডিসি মহাকাব্যের ট্রয় যুদ্ধের পর স্বদেশ ঈথিকায় ফেরার পথে ওডিসিয়াসের উনিশ বৎসরের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে রামের বনবাসকালের নানা ঘটনার মিল রয়েছে। এসব কারণে রামায়ণ বিশেষজ্ঞদের মতে রামায়ণ প্রকৃতপক্ষে ভারতের পরিবেশে ইলিয়াড-এর ছায়া অবলম্বনে রচিত, হয়তোবা কিছুটা ওডিসির ছায়াও পড়ে থাকতে পারে। জার্মানির বিশিষ্ট রামায়ণ বিশেষজ্ঞ ডঃ অ্যালব্রেকট ওয়েবার এই মত পোষন করতেন। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ সালের আগেই রচিত হয়ে গিয়েছিল। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই মত প্রকাশ করেছেন যে, হোমারের ইলিয়াড মহাকাব্যই আগে রচিত হয়ছিল এবং পরবর্তী কালে রামায়ণ এ ইলিয়াড থেকে অনেক উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছিল। তবে কেউ

কেউ এ ব্যাপারে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তাঁদের অভিমত হচ্ছে, ‘‘রামায়ণ বা মহাভারত কাহিনী দুটি বিশ্বের দুটি চিরন্তন সত্যকে আশ্রয় করে লিখিত। একটা হচ্ছে নারী অন্যটি হচ্ছে ভূমি। রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়েছিল নারী হরণকে কেন্দ্র করে আর মহাভারতের কুরুক্ষেত্র কাহিনী রচিত হয়েছে ভূমিকে কেন্দ্র করে। নারী হরণ ও তার জন্য যুদ্ধ, এই বিষয় বস্তুর জন্য গ্রীক কবি হোমারের কাছে যাবার প্রয়োজন ছিল না! (*এ ব্যাপারে আগ্রহীরা পড়ে দেখতে পারেন,* ***ডঃ অতুল সুর, হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য; পৃষ্ঠা- ৩৩-৪২***) আবার অনেকে এমন মনে করেন রামায়ণ ও ইলিয়াড দুটি মহাকাব্যই আরো প্রাচীন কোন উৎস থেকে এসেছে। অনেক বৎসর আগে মাল্লাদী ভেংকটরত্নম নামে অন্ধ্র প্রদেশের একজন পন্ডিত দুই খন্ডে বই লিখে প্রমান করার চেষ্টা করেন যে, রাম ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মিশরের সবচেয়ে বিখ্যাত ফ্যারাও দ্বিতীয় র‍্যামেসিস, সীতা ছিলেন ইখনাতোনের ভগ্নী সীতামন, আর রাবণ ছিলেন একজন হিটাহট রাজা (***Malladi Venkata Ratnam, Rama, The Greatest Pharao of Egypt, 2 vols. Rajahmundry, 1934***)। জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায় ও তাঁর **মহাকাব্য ও মৌলবাদ** গ্রন্থে (**পৃষ্ঠা- ৩৩**)নীরদ চৌধরীর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘‘Contient of Cire’’ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, ‘রামায়ণ কাহিনী আদতে মধ্যপ্রাচ্যের কোন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে আর্যদের সঙ্গে তা ভারতে প্রবেশ করে এবং উত্তর ভারত থেকে ক্রমশ দক্ষিণ ভারতে বিস্তারের ঐতিহাসিক পটভূমিতে নানা ভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে ভারতের রামায়ণ এর রূপ ধারণ করে।’’ **অবশেষে কি বোঝা গেল?** (১) রাম কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র, এখন পর্যন্ত প্রমানিত নয়। (২) মূল রামায়ণে কোন অবতারতত্ত্ব নেই, এবং পল্লবিত রামায়ণে যে বিষ্ণুর অবতার তত্ত্ব প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে, তা শুধুমাত্র ভ্রান্ত চিন্তারই প্রতিফলন। (৩) রামায়ণের লৌকিক ব্যাখ্যা রয়েছে (৪) এবং রামায়ণ মহাকাব্যে বিদেশী কাব্যের প্রভাব একেবারে উড়িয়ে দেয়াও যাচ্ছে না। সুতরাং এখন আমরা লেখক **বেনজীন খানের** কথামতো বলতে পারি, অবশেষে ‘রাম’ সম্পর্কিত এক ‘রামধাঁধাঁ’ থেকে মুক্ত হওয়া গেল।

বাবরি মসজিদ সমাচার : এখন দেখা যাক, এই ‘রামধাঁধা’কে কেন্দ্র করে সারা উপমহাদেশে বিশেষ করে ভারতে কি লংকাকান্ডই না ঘটে চলছে দীর্ঘকাল ধরে। নিম্নে বাবরি মসজিদ নিয়ে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী তারিখ অনুসারে উল্লেখ করা হলো। ইচ্ছাকৃত ভাবেই বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া হয় নাই-

(১) ১৫২৮ সালে ভারতের প্রথম মোঘল সম্রাট বাবর এর রাজ্য সভার সদস্য মীর বাকি কর্তৃক অযোধ্যা নগরীতে

(বাবরি মসজিদ; যারে নিয়ে এতো লঙ্কাকান্ড!)

মসজিদ নির্মান করা হয়, পরবর্তীতে যার নাম হয় বাবরি মসজিদ।

(২) যতদূর জানা যায়, ১৮৫৫ সালে অযোধ্যায় শুরু হয় রাম জন্মভূমি ও বাবরি মসজিদ নিয়ে

সর্বপ্রথম হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গায় ৭৫ জনের মৃত্যু ঘটে।

(৩) ১৮৫৭ সালে জনৈক হিন্দু কর্তৃক বাবরি মসজিদ প্রাঙ্গনে রামের প্রতিমা স্থাপন করা হয়। এরপর হিন্দু-মুসলিম উভয়ের প্রার্থনা শুরু হয় মসজিদ প্রাঙ্গনে।

(৪) ১৮৫৯ সালে তৎকালীন বৃটিশ সরকার মসজিদ প্রাঙ্গনে দেয়াল নির্মান করে হিন্দু-মুসলিম উভয়ের প্রার্থনা স্থান আলাদা করে দেয়।

(৫) ১৮৮৫ সালে মসজিদ প্রাঙ্গনে রাম মন্দির নির্মানের জন্যে সর্বপ্রথম মামলা রজ্জু করেন জনৈক হিন্দু মোহন্ত রঘুবর দাস।

(৬) ১৯৩৪ সালে সারা ভারত জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় হিন্দু মৌলবাদীরা বৃটিশ সরকার কর্তৃক নির্মিত মসজিদ প্রাঙ্গনের দেয়ালের একাংশ ভেঙ্গে ফেলে এবং ক্ষতিগ্রস্থ করে মসজিদ।

(৭) ১৯৪৯ সালে অত্যন্ত গোপনে মসজিদের ভিতরে রাম মুর্তি স্থাপন করা হয়। উদ্ভুত পরিস্থিতে তৎকালীন ভারতীয় সরকার বাবরি মসজিদকে বিতর্কিত এলাকা ঘোষনা করে এবং মসজিদটি বন্ধ করে দেয়।

(৮) ১৯৫০ সালে রাম মন্দিরের দাবি নিয়ে দ্বিতীয় পিটিশন করেন গোপাল সিং বিশারদ। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরী হয় যখন তৃতীয় পিটিশন দাখিল করেন রামচন্দ্র পরমহংস রাম জন্মভুমির দাবি নিয়ে। পহেলা ফেব্রুয়ারি ফয়জাবাদ আদালত দুটো পিটিশন একত্রিত করেন।

(৯) ১৯৬১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সুন্নী কেন্দ্রীয় বোর্ড কর্তৃক একটি পিটিশন দাখিল করা হয় এবং মসজিদ প্রাঙ্গন থেকে রাম মুর্তি সরিয়ে নেয়ার দাবি জানানো হয়।

(১১) ১৯৮৩ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভি এইচ পি) মসজিদ প্রাঙ্গনে রাম মন্দির নির্মানের জন্য আন্দোলন শুরু করে।

(১২) ১৯৮৪ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা লাল কৃষ্ণ আদভানি'র নেতৃত্বে 'মুক্ত রাম জন্মভুমি' এবং মন্দির নির্মানের জন্যে কমিটি গঠন করা হয়।

(১৩) ১৯৮৬ সালে নিম্ন আদালত মসজিদ বন্ধের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় এবং হিন্দুদের প্রার্থনার জন্য অনুমতি প্রদান করে।

(১৪) ১৯৮৯ সালে সাবেক ভারতীয় কংগ্রেজ পার্টি প্রধান ও প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী রাম মন্দির নির্মানের জন্যে শিলান্যাস করেন। এ নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শতাধিক ব্যক্তি নিহত হয়।

(১৫) ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে মন্দিরের দাবি নিয়ে সর্বশেষ মামলাটি রজ্জু করেন অবসর প্রাপ্ত বিচারক ডি এন আগারওয়াল। এই মাসেই এহালাবাদ হাইকোর্ট সবগুলো মামলাকে (১৮৮৫, ১৯৫০, ১৯৫০, ১৯৬১, ১৯৮৯) একত্রিত করেন এবং তিন জন বিচারকের সমন্বয়ে একটি বেঞ্চ গঠন করে শুনানি শুরু হয়। এবং বলা হয় রায় ঘোষনার আগ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রন বলবৎ থাকবে।

(১৬) ১৯৯০ সালে তৎকালীন ভারতীয় জনতা পার্টি সভাপতি লাল কৃষ্ণ আদভানি রাম মন্দির নির্মানের জন্যে রথ যাত্রার আয়োজন করেন।

(এল কে আদভানী'র রথ যাত্রা -অক্টোবর, ১৯৯০)

সেই সময় লক্ষাধিক কর সেবক (হিন্দু ধর্মীয় স্বেচ্ছাসেবী) অযোধ্যায় একত্রিত হন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে শতাধিক ব্যক্তি নিহত হন।

(১৭) ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে রাম মন্দির নির্মানের জন্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু হয়।

(১৮) ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর। ঐতিহাসিক কালো দিবস। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, শিবসেনা, করসেবক ও অন্যান্য হিন্দু মৌলবাদী মিলে প্রায় ৩ লক্ষ্যাধিক সমবেত হয় অযোধ্যা নগরীতে।

(বাবরি মসজিদ ভাঙ্গন চলছে। বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যবহারিক নমুনা- ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯২)

শুরু হল ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা। সাথে সাথে শুরু হল সাম্প্রদায়িক গণহত্যাকান্ড। যার উত্তপ্ত বিষ বাস্প নিমিষেই ছড়িয়ে পড়লো সমগ্র উপমহাদেশে। ভারতে শুরু হল মুসলিম নিধন আর বাংলাদেশ, পাকিস্থানে শুরু হল

(বাবরি মসজিদের উপরে করসেবকদের নগ্ন উল্লাস!)

সংখ্যালঘু হিন্দু নিধন। পাল্টাপাল্টি মন্দির-মসজিদ ভাঙ্গা চললো। সারা বিশ্বে প্রচন্ড নিন্দার ঝড় উঠল, কিন্তু এই উপমহাদেশে ক্ষমতার মাখনের স্বাদে মগ্ন শাষকগোষ্ঠী ও তার তল্পিবাহক

গোষ্ঠীরা কানে তুলো গুজে বুজে বসে থাকলো কিছুদিন। শুধুমাত্র ভারতেই এই সাম্প্রদায়িক গণহত্যাকান্ডে দুইহাজারের অধিক লোক নিহত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। এই উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে নিহতের সঠিক পরিসংখ্যান আজও পাওয়া গেল না।

(১৯) ১৯৯৪ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট একটি রুলনিশি ঘোষনা করলো।

(২০) ১৯৯৮ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি ঘোষনা দিল- রামজন্মভূমি ও বাবরি মসজিদ নিয়ে আদালতের রায় মেনে নেবে।

(২১) ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের হিন্দু ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো ঘোষনা করল- আদালত ইচ্ছাকৃতভাবে সময় নষ্ট করছে, আদালতের জন্য আর অপেক্ষা করবে না। তারা মার্চের ১৫ তারিখে রাম মন্দির নির্মানের কাজ শুরু করে দিবে।

(২২) ২০০২ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী। এক দশক পর আবার শুরু হল আরেকটি ঘৃন্য অধ্যায়। গুজরাটে করসেবকদের বহন কারী একটি ট্রেনে মুসলিম মৌলবাদীরা আগুন ধরিয়ে দেয়। এই আগুনে ৫৮ জন করসেবক পুড়ে

(গোধরার আগুন! নিভবে কবে বলতে পারেন?)

নিহত হন। শুরু হয় আবার ধর্মরাজ্য (!) প্রতিষ্ঠার পালা। পাইকারী ভাবে সংখ্যালঘু নিধন শুরু হয়। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করুন- ২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০০২, আহমেদাবাদ থেকে তোলা ছবি।

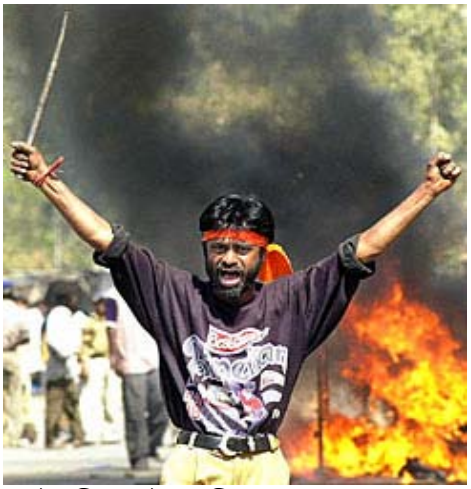

(এই কি সেই কল্কি অবতার! যার কথা গীতা'য় বলা হয়েছে- পরিত্রানায় সাধুনাং, বিনাশায়চঃ

দুষকৃতামঃ....)

হিন্দুধর্মরক্ষা(!) আর করসেবক হত্যার প্রতিশোধ নিতে হিন্দু মৌলবাদীরা ঝাপিয়ে পড়লো সংখ্যালঘুর উপর। হত্যা, ধর্ষন, বাড়িঘর লুটপাট, অগ্নিসংযোগ কিছুই বাদ গেলো না। গুজরাট রাজ্যের নরেন্দ্র মুদি প্রশাসনের সহযোগীতা প্রতিশোধের আগুনে ঘি ঢেলে দিল। ৫৮ জন করসেবক হত্যাকান্ডের প্রতিশোধের আগুনে তিন হাজার এর বেশি লোক প্রাণ হারালো। এর অধিকাংশই যে সংখ্যালঘু মুসলিম ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায় সে কথা বলাই বাহুল্য।

(২৩) ২০০২ সালের ১৩ই মার্চ- ভারতের সুপ্রিম কোর্ট অযোধ্যা নগরীতে রাম মন্দির ও বাবরি মসজিদ নিয়ে সব ধরনের ধর্মীয় কর্মসুচী নিষিদ্ধ ঘোষনা করে।

(২৪) ২০০২ সালের এপ্রিল মাস। তিন জন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রামজন্মভুমি ওবাবরি মসজিদ নিয়ে মামলার শুনানি শুরু করে।

(২৫) ২০০৩ সালের জানুয়ারি। আদালতের নির্দেশে প্রত্নতত্ত্ববিদরা বাবরি মসিজদ এলাকায় খনন কাজ শুরু করে।

(২৬) ২০০৩ সালের আগষ্ট। প্রত্নতত্ত্ববিদদের একটি রিপোর্টে বলা হয়, বাবরি মসজিদ এর নিচে মন্দিরের কিছু নমুনা পাওয়া গেছে। কিন্তু অল ইন্ডিয়া বাবরি মসজিদ একশন কমিটি এই রিপোর্ট প্রত্যাখান করে।

(২৭) ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর। আদালতে ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার জন্য সাতজন হিন্দু নেতাকে দোষী সাব্যস্ত করে চার্জশিট দাখিল করা হয়, কিন্তু সাবেক ডেপুটি প্রাইম মিনিষ্টার এল কে আদভানিকে চার্জশিট থেকে অব্যহতি দেয়া হয়। যদিও বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা থেকে শুরু করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ও তিনি ঐ এলাকায় উপস্থিত ছিলেন।

(২৮) ২০০৫ সালের জুলাই। কয়েকজন সন্দেহভাজন মুসলিম জঙ্গী রাম মন্দির সংলগ্ন অংশে অতর্কিতে আক্রমন চালায়। নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে জঙ্গীদের সংঘর্ষে নিরাপত্তা প্রাচীরের কিছু অংশ ভেঙ্গে যায়। এবং এতে ঘটনাস্থলে ছয় জনের মৃত্যু ঘটে।

রামায়ণ মহাকাব্য হিসেবে অতুলনীয় এবং সাহিত্য জগতে এর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু এই মহাকাব্য কে ধর্মগ্রন্থ বানিয়ে, এর তথাকথিত মর্যাদা রক্ষার নাম করে যা করা হচ্ছে তাতে কি এই মহাকাব্যকেই অপমান করা হচ্ছে না? এর অবমূল্যায়ন ঘটছে না? আমাদের মনে হচ্ছে, রাম জন্মভূমি আর বাবরি মসিজদ নিয়ে ঘটনার রেশ আরও দীর্ঘকাল আমাদের বহন করতে হবে, এরকম হতহতের ঘটনা ঘটতেই থাকবে, ঘটতেই থাকবে, রক্তের হোলি খেলা চলতেই থাকবে। মীমাংসার সম্ভবনা সুদূর পরাহত।

সবশেষে কয়েকটি কথা বলে শেষ করতে চাই, যারা পরিসংখ্যান দিয়ে মানুষের মৃত্যুর হিসাব নেন, সংখ্যার বিচারে আবেগ অনুভুতির বহিপ্রকাশ ঘটান, যারা রক্তের বদলে রক্ত চান, তাদের উদ্দেশ্যে আমার এই বক্তব্য নয়। যারা স্থান, কাল, পাত্রের উর্ধ্বে উঠে মানবতার কথা বলেন, মনুষ্যত্বের বিকাশ চান তাদেরকে বলছি; নিচের দুটি ছবি লক্ষ্য করুন, আমি লিখার কোন ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। কত প্রশ্ন জাগে, উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। আসলেই কি আমরা মা-নু-ষ?

(রাম রাজত্ব কতো দুর....?) (শুনতে কি পাও তুমি এই আর্তনাদ....?)

এই কি আমাদের আধুনিক সভ্যতার নমুনা? কোন সভ্যতা প্রজনন করেছি আমরা? এখানে ডারউইনের বিবর্তনবাদ না ভাববাদীদের আশরাফুল মাকলুকাত, কোনটি সত্য মনে হয়? ঈশ্বর নামক কল্পিত বিশ্বাস নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের লড়াইয়ে আর কতো রক্ত ঝরবে? আর কতটি লাশ পড়লে, কতটি ধর্ষন হলে রাম রাজত্ব বা খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে? উত্তরগুলো আমার জানা নেই? আপনাদের কি জানা আছে?

সমাপ্ত

****

তথ্যসুত্র :-

(১) জয়ান্তানুজ বন্দোপাধ্যায়, **মহাকাব্য ও মৌলবাদ** ; এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।

(২) বেনজীন খান, **দ্বন্দ্বে ও দ্বৈরথে** ; চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা।

(৩) ড: আর এম দেবনাথ, **সিন্ধু থেকে হিন্দু** ; রিডার্স ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা।

(৪) সুকুমারী ভট্টাচার্য, **প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য** ; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

(৫) পল্লব সেনগুপ্ত, **ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা উৎসের সন্ধানে** ; সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা।

(৬) ডঃ অতুল সুর, **হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য** ; সাহিত্যলোক, কলকাতা।

(৭) নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, **বস্তুবাদীর ভারত জিজ্ঞাসা** ; সাহিত্যপ্রকাশ, কলকাতা।

(৮) http://www.time.com/time/asia/features/india_ayodhya/timeline/

(৯) http://www.vepachedu.org/Babri-history.html

(১০) http://en.wikipedia.org/wiki/Babri_mosque

(১১) http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1844930.stm

- -

আবার আসিব ফিরে....
অন্য কোন অতিকথনকে বিশ্লেষন করে॥